বণিক বার্তা
সমৃদ্ধির সহযাত্রী

সম্পাদকীয়, , , ,

উচ্চশিক্ষায় বাংলাদেশ: ভবিষ্যতের চ্যালেঞ্জ

ড. এ. কে. এনামুল হক | ২১:২৩:০০ মিনিট, অক্টোবর ৩০, ২০১৮

শিক্ষা ব্যবস্থায় পরিবর্তন আমাদের সবারই কাম্য। বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় পরিবর্তনের বেশ কয়েকটি দিক রয়েছে। এ পরিবর্তনগুলো আমাদের অনেকেই দেখেছি। তবে তার ফল খুব একটা বিশ্লেষণ করিনি। যেমন ধরুন, ১৯৭২ সালে আমাদের প্রাথমিক শিক্ষায় আসে রাষ্ট্রীয়করণের নিয়ম। প্রাথমিক শিক্ষাকে রাষ্ট্রীয়করণের মাধ্যমে আমরা শিক্ষাকে করেছি সাশ্রয়ী। ফলে গরিব মা-বাবাও পেরেছেন তার সন্তানকে শিক্ষাঙ্গনে পাঠাতে। আবার একই সঙ্গে তৈরি হয়েছে বিদ্যায়তন ও জনগণের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কের বিচ্ছেদ। শিক্ষক এখন আর জনগণের কাছে দায়বদ্ধ থাকলেন না, তিনি দায়বদ্ধ হলেন সরকারের কাছে। তার কর্মের বিচার-বিশ্লেষণের সব ক্ষমতা হারাল স্থানীয় জনগণ, যাদের দ্বারা বিদ্যায়তনটি এতদিন ধরে লালিত হয়ে আসছিল। ছাত্র, অভিভাবক কিংবা প্রতিষ্ঠাতাও এখন শিক্ষকের কাছে কেউ নন। কারণ তার বেতন দেয় সরকার। নিজেকে তিনি সরকারি কর্মকর্তা মনে করেন! দায়বদ্ধতা না থাকায় তিনি স্কুলে কী করছেন, কতক্ষণ থাকছেন, কী পড়াচ্ছেন, তার কোনো আনুষ্ঠানিক কারণ তিনি জনগণের কাছে দেখাতে বাধ্য নন। ফলে কেবল সরকার ও তার শিক্ষা বিভাগের ওপর ভরসা করেই চলে বিদ্যায়তনগুলো।

বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির দায় হলো, বিদ্যালয়ের জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ করা, শিক্ষককে প্রশ্ন করা নয়। ফলে প্রাথমিক শিক্ষায় নামে ধস। ক্রমে সমাজের প্রতি শিক্ষকের দায়বদ্ধতা শূন্যের কোটায় নেমে যায়। একই ব্যবস্থা বিস্তৃতি লাভ করে উচ্চবিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়গুলোয়ও। ফলে শিক্ষা বিভাগ ও মন্ত্রণালয়ের ক্ষমতা বাড়ে আর কমে যায় স্থানীয় জনগণের প্রভাব। অথচ তাদেরই সন্তানদের পড়ানোর কাজে এ শিক্ষকরা নিয়োজিত।

উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে আশির দশক থেকেই বাড়তে থাকে শিক্ষার্থীর সংখ্যা। জনসংখ্যা বৃদ্ধি, সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা ও সবার জন্য শিক্ষানীতির ফল এগুলো। শিক্ষার চাপ বাড়তে থাকে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোয়ও। তাই আশির দশকের শেষ সময়ে দেখা যায়, হাজার হাজার ছাত্রছাত্রী বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে ভর্তি হতে না পেরে চলে যাচ্ছে বিদেশে, বিশেষত ভারতে। শিক্ষার্থীদের এ বিদেশযাত্রায় ডলার রিজার্ভে চাপ বাড়ে। তাই ১৯৯২ সালে তখনকার সরকার বিরোধী দল, সমাজতন্ত্রীমনা রাজনীতিবিদ ও বুদ্ধিজীবীদের চরম বিরোধিতার মুখেও অনুমোদন দেয় বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের। আসে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়। শিক্ষার বাজারে প্রতিযোগিতা বাড়ে। চাহিদা ও জোগানের পরিবর্তনে হ্রাস পায় বিদেশগামী শিক্ষার্থীর সংখ্যা।

কিন্তু এর স্থায়িত্ব বেশিদিনের হয় না। এখন প্রতি বছর পাস করা উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার্থীর ১৫ থেকে ২০ শতাংশের স্থান সংকুলান হয় সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয়। বাকিদের মধ্যে সামর্থ্যবানরা চলে যায় বিদেশে আর অন্যরা ভর্তি হয় সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে। ২০১৬ সালের হিসাব অনুযায়ী সরকারি অনুমোদন নিয়ে হাজার হাজার শিক্ষার্থী পাড়ি দিয়েছে ভারত, যুক্তরাষ্ট্র, চীন ও মালয়েশিয়ায়। ফলে এক হিসাব অনুযায়ী প্রতি বছর ন্যূনতম ৪-৫ হাজার কোটি টাকা যাচ্ছে বিদেশে কেবল উচ্চশিক্ষা খাতে। বিদেশের সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান যে গুণগত মানে উত্কৃষ্ট তা নয়। হায় হায় কোম্পানি জাতীয় বহু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ইউকে বা ইউএসএতেও রয়েছে, যেখানে সন্তানদের পাঠিয়ে অনেকে বিত্তহীন হয়েছেন।

অন্যদিকে দেশে উচ্চশিক্ষায় কী হচ্ছে, তাও আমাদের অনেকেরই বোধগম্য নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশোনা কিংবা শিক্ষকের মান কী, তা নিশ্চিত করার কোনো উপায় বাস্তবে নেই। চাহিদার তুলনায় জোগান কম হওয়ায় অভিভাবকদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বা বিষয় বাছাই করারও অধিকার নেই। ভর্তি করতে পারাটাই এখানে মুখ্য। সন্তানকে ভর্তি করতে না পারলে তার জীবন ব্যর্থ হবে, তাই যেকোনো মূল্যে তাকে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি করাতে পারাটাই তাদের একমাত্র চাহিদা। এরই মধ্যে বেশকিছু বেসরকারি প্রতিষ্ঠান তাদের শিক্ষার নিজস্ব মানদণ্ড তৈরি করেছে। তবে সবাই নয়। অন্যদিকে শিক্ষাঙ্গনের মান নিয়ন্ত্রক সংস্থা বলতে কিছু তৈরি হয়নি এ দেশে। যে সংস্থাটি রয়েছে, তাদের মুখ্য দায়িত্ব সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুদান প্রদান করা। সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যুষিত এ প্রতিষ্ঠানের অধিকর্তাদের অনেকেই এখনো বুঝতে পারেন না বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো শিক্ষাঙ্গনে কী অবদান রাখছে।

শিক্ষার মান নিয়ন্ত্রণ করা যায় দুভাবে। এর একটি হলো পারস্পরিক সহযোগিতা বা প্রতিযোগিতার মাধ্যমে। আর অন্যটি হলো নিয়ন্ত্রক সংস্থার মাধ্যমে। দ্বিতীয়টি আমাদের দেশে বহুল প্রচলিত কিন্তু তার ফলে বেড়ে যায় দুর্নীতি। তাই শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয় মান নিয়ন্ত্রণ। নিয়ন্ত্রণের বাড়াবাড়িতে একসময় শিক্ষা পাঠ্যক্রম হয়ে যায় বন্দি। কোনো প্রকার গবেষণা কিংবা পর্যালোচনা ছাড়াই আসে নিয়মকানুন। অনেকটাই কেবল লাল ফিতার কার্যক্রম। ফলে দুর্নীতি প্রসারিত হয়। শুধু তাই নয়, শিক্ষার সঙ্গে জড়িত নয় এমন পেশাদারি প্রতিষ্ঠানও উচ্চশিক্ষাকে নিয়ন্ত্রণ করতে উৎসাহিত হয়। ফলে উচ্চশিক্ষার পাঠ্যক্রম পরিবর্তন হয়ে যায় তাদের কাছে বন্দি। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে কী পরিবর্তন আনতে হবে, তার দায়িত্বে যখন পেশাদারি প্রতিষ্ঠান, যেমন বার কাউন্সিল বা ফার্মেসি কাউন্সিল আবির্ভূত হয়, তখন উচ্চশিক্ষার বিকাশ ব্যাহত হতে বাধ্য। পেশাদার প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম পেশাজীবীদের নিয়ন্ত্রণ করা, উচ্চশিক্ষাকে নিয়ন্ত্রণ করা নয়। তাদের দায় পেশাজীবীদের ওপর, শিক্ষকের ওপর নয়। শিক্ষক তার জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও মননশীলতার ভিত্তিতে উচ্চশিক্ষায় প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনবেন, যাতে শিক্ষার্থীদের আগামী দিনের প্রয়োজনকে নতুন প্রজন্মের পেশাজীবীতে পরিণত হয়। আর পেশাজীবী সংস্থার কাজ হলো বর্তমান পেশজীবীদের মান সমন্বয় করা। নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলোর অতিরিক্ত নিয়ন্ত্রণের ফলে কেবল মান বৃদ্ধিতে যে স্থবিরতা দেখা দিচ্ছে তা নয়, বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মধ্যে প্রতিযোগিতা হ্রাস পাচ্ছে। তাদের পাঠ্যক্রমে থাকে না কোনো বৈচিত্র্য কিংবা কোনো দূরদর্শী চিন্তা। অথচ আমরা জানি, পাঠ্যক্রমের বৈচিত্র্য ও প্রতিযোগিতাই পারে শিক্ষার গুণগত মান উন্নত করতে।

বাংলাদেশ ক্রমাগত বৈশ্বিক অর্থনীতির সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে। আমাদের যোগাযোগের মাধ্যম চারটি— রফতানি, আমদানি, বিনিয়োগ ও সাময়িক অভিবাসন। আমরা জানি আমাদের আমদানির পরিমাণ রফতানির চেয়ে অনেক বেশি। তাই আমাদের দেশে বিনিয়োগ (বিদেশী) বৃদ্ধি ও জনশক্তি রফতানি দেশের অর্থনীতিকে শক্তিশালী করার প্রধান উপায়। বিদেশী বিনিয়োগ দেশে বৃদ্ধি পাবে তখনই, যখন দেশে থাকবে পর্যাপ্ত উপকরণ, যেমন খনি কিংবা জমি, পুঁজি বা জনশক্তি। অশিক্ষিত কিংবা অর্ধশিক্ষিত জনগণ বিদেশী বিনিয়োগকে ততটা উৎসাহিত করে না। ফলে কেবল শ্রমনির্ভর খাতে বিনিয়োগ হবে। এর ফলে তৈরি হয়েছে গার্মেন্ট শিল্প এবং রফতানির ক্ষেত্রে বাংলাদেশের বন্ধ্যত্ব। আমরা কেবল একটি পণ্যই রফতানি করছি। অথচ যেসব দেশে শ্রমিকের দক্ষতা বেশি, সেই সব দেশে বাড়ে বিদেশী বিনিয়োগ। জনশক্তি রফতানির ক্ষেত্রেও একই চিত্র। বিদেশে শ্রমিক প্রয়োজন। তবে ক্রমাগত দক্ষ শ্রমিকের চাহিদা বাড়ছে। অদক্ষ শ্রমিকের চেয়ে দক্ষ শ্রমিক প্রায় ১০ গুণ বেশি আয় করেন। ফলে একজন দক্ষ শ্রমিক বিদেশে পাঠানো ১০ জন অদক্ষ শ্রমিক পাঠানোর

সমতুল্য। শ্রমিকের দক্ষতা নির্ভর করে শিক্ষার মানের ওপর। তাই শিক্ষার মান পরিবর্তন অত্যন্ত জরুরি। গতানুগতিক ধারা বা চিন্তা দ্বারা শিক্ষার মান পরিবর্তন করা সম্ভব হবে না।

এক বছর আগে গিয়েছিলাম রাজস্থানে। বেড়াতে গিয়ে যখন উপস্থিত হলাম জয়সেলমের শহরে, তখন ভাবলাম সত্যজিৎ রায়ের সোনার কেল্লা না দেখে যাওয়া যায় না। বলা বাহুল্য, জয়সেলমের শহরেই সোনার কেল্লা সিনেমার শুটিং হয়েছিল। আর তাই সেখানে বাঙালিদের কদর বেশি। মরুভূমির এ শহরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত একটি দুর্গেই সোনার কেল্লার অভিনয় হয়েছিল। বিশাল কেল্লা ঘুরে দেখানোর জন্য একজন ইংরেজি ভাষায় পারদর্শী গাইড নিলাম। মাঝবয়সী এ গাইড আমাকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাচ্ছিল। তার ইংরেজি ভাঙা ভাঙা। বুঝতে পারছি সে ইংরেজি বলতে অভ্যস্ত নয়। একপর্যায়ে জিজ্ঞেস করলাম— কোন পর্যন্ত পড়াশোনা করেছ? স্যার, মাস্টার্স ডিগ্রি। কী বিষয়ে? পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন। কী বল? তারপর? কোথাও চাকরি পাইনি। তাই শেষ পর্যন্ত ট্যুর গাইড হতে প্রশিক্ষণ নিয়েছি। সেই থেকে গাইড। আমার এ প্রশিক্ষণের ফলে আমি সাতটি প্রদেশে ট্যুর গাইড হিসেবে কাজ করতে পারব। বেতন পাও? না, আপনারা যা দেন তাই আমার প্রতিদিনকার বেতন। আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও অর্থনীতির অধ্যাপক শুনে সে বেশ উৎসাহিত। স্যার, সম্ভব হলে আপনাকে আমার বাসায় নিয়ে যেতাম। কেন? কারণ আমার স্ত্রীর সঙ্গে আপনার পরিচয় করিয়ে দিতাম। ও এখন অর্থনীতিতে মাস্টার্স করছে। সে একজন স্কুলশিক্ষক। তুমি স্কুলশিক্ষক হতে পারলে না? না স্যার, পারলাম না। কেন? কোটা স্যার, কোটার জন্য। তবে স্যার কোটার জন্য আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় ধস নেমেছে। কেমন করে? যেমন ধরুন, আমি স্কুলশিক্ষক হওয়ার জন্য পরীক্ষা দিয়েছিলাম কিন্তু পেলাম না। ৫০-এর ওপর নম্বর পেয়েও। কিন্তু আমারই সতীর্থ একজন পেল। ১৭ নম্বর পেয়ে। তাও আবার অংকের শিক্ষক হিসেবে। অথচ সে অংকে পাসই করেনি! কী বল? হাঁ স্যার, এটিই সত্য। এখন চাকরির বয়স নেই, তাই এভাবেই কাটবে জীবন। তার কথায় আঁতকে উঠলাম। ভোটের রাজনীতিতে আসক্ত হয়ে চালু করা এসব নিয়ম বর্তমান প্রজন্মে ভোট বাড়ালেও আগামী প্রজন্মের পিঠে ছুরিকাঘাতের সমান। শিক্ষা ব্যবস্থার প্রাণ হলো শিক্ষক। শিক্ষক ভালো না হলে ছাত্র ভালো হয় না।

কয়েক দিন আগে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়োগ কমিটিতে বসেছি। অর্থনীতিতে একটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করা প্রধানমন্ত্রীর স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীকে যখন জিজ্ঞেস করলাম চাহিদার রেখা কেন নিম্নগামী, তার ব্যাখ্যা কী? উত্তরে সে যা বলল, তাতে নিজেকে মাটিতে মিশিয়ে দিতে হলো। বুঝতে পারলাম শিক্ষকের মান কোথায় নেমেছে। ইংরেজিতে বলে, রট লার্নিং বা মুখস্থ বিদ্যা আমাদের ভর করেছে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আমাদের সন্তানরা আসে সার্টিফিকেটের জন্য। জ্ঞানার্জনের জন্য নয়।

আমাদের শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা যখন ক্রমে বাড়ছে তখন আমাদের কী করার আছে? কেউ কেউ ভাবেন, উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত না করে শিক্ষার্থীকে ভোকেশনাল শিক্ষায় পাঠানো উচিত। অনেক সময় ভাবি, একবার জিজ্ঞেস করি, আপনার সন্তানকে কি পাঠাবেন? ভোকেশনাল শিক্ষা পাঠ্যক্রম মানে হলো শিক্ষার্থী পড়াশোনার মধ্যে কর্মক্ষম হয়ে উঠবে। ফলে তার কাজ পাওয়ার সম্ভাবনা বাড়বে। আর উচ্চশিক্ষা কার্যক্রম মানে অনেকের ভাষায় তাকে 'আঁতেল' তৈরি করা। যার জগৎ সম্পর্কে কোনো ধারণা থাকে না। আমাদের উচ্চশিক্ষা কার্যক্রমের এটি একটি বড় দুর্বলতা। আমাদের ভাবনা উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিতজনকে হয় কিছু করতে হবে না (জমিদারের সন্তান!) অথবা সে কিছু করতে পারবে না (ফলে সে হবে শেষ পর্যন্ত দুর্নীতিগ্রস্ত!)। ধারণাটি সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। আধুনিক উচ্চশিক্ষা কার্যক্রম জ্ঞান আহরণ, জ্ঞানের উত্কর্ষ বৃদ্ধি এবং জ্ঞানের ব্যবহারে শিক্ষার্থীদের তৈরি করে। অথচ বাংলাদেশে আমরা এখনো এ ধারণা বুঝতে সক্ষম হইনি। এর প্রধান কারণকে এভাবে বলা যায়, যেখানে আমাদের সন্তানরা তৈরি হচ্ছে একুশ শতকের বাজারে প্রতিযোগিতা করার জন্য, সেখানে আমাদের অভিভাবকরা রয়েছেন উনিশ শতকের ভাবনা নিয়ে। আর শিক্ষকরা রয়েছেন বিশ শতকের জ্ঞান নিয়ে। ফলে শিক্ষা ব্যবস্থা তৈরি করছে অথর্ব ও অক্ষম এক জনশক্তি। এ থেকে পরিত্রাণ প্রয়োজন।

শিক্ষার ক্ষেত্রে আমরা এখনো ভাবি না চাকরির বাজার কী বলছে? টনি ব্লেয়ার এক সময় বলেছিলেন, ব্রিটেনে ইসলামী শিক্ষা কার্যক্রম বেকার তৈরি করছে না, আর এর মূলমন্ত্র হলো স্বপূরক মতবাদ (self-fulfilling prophecy)। ফলে এখানে কোনো ব্যবহারিক বিষয় শিখতে হয় না। এদের প্রধান লক্ষ্য পড়া শেষে তৈরি আরো একটি মাদ্রাসা, আর তাতেই মেলে চাকরি। আমাদের উচ্চশিক্ষাও ক্রমাগত এ ধরনের মতবাদে আকৃষ্ট হচ্ছে। ভালো ছাত্ররা বই মুখস্থ করে 'শিক্ষিত' হচ্ছে। আর তার পরই যোগ দিচ্ছে শিক্ষকতা পেশায়; তাদের নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য। অথচ আমাদের ধারণা ছিল, শিক্ষক অন্যের ভাগ্য পরিবর্তন করতে সহায়তা করেন। শিক্ষা পাঠ্যক্রমকে তাই আমাদের ঢেলে সাজানো উচিত। যে পাঠ্যক্রম শিক্ষার্থীর উৎপাদন দক্ষতার পরিবর্তন করতে পারে না, তা বন্ধ করা উচিত। তবে আমাদের মানতেই হবে শিক্ষা পাঠ্যক্রম ও প্রশিক্ষণ পাঠ্যক্রমের প্রধান পার্থক্য হলো ব্যবহারিক। প্রশিক্ষণ পাঠ্যক্রম সাধারণত শতভাগ ব্যবহারিক আর শিক্ষা পাঠ্যক্রম আংশিক ব্যবহারিক ও আংশিক সৃজনশীল।

আধুনিক জগতে শিক্ষা ব্যবস্থাকে খাঁচায় বন্দি করে রাখা উচিত নয়। আমরা অতিরিক্ত নিয়মনীতিতে শিক্ষা ব্যবস্থাকে আচ্ছাদিত করে ফেলছি। মান নিয়ন্ত্রণের নামে আমরা শিক্ষাকে টিক চিহ্নের বাক্সে আবদ্ধ করছি। পৃথিবীর কোনো উন্নত শিক্ষায়তনে নিয়ন্ত্রক সংস্থা এ ধরনের নিয়ম চালু করে না। আমাদের নিয়ন্ত্রকরা এখন শিক্ষক নিয়োগ, প্রশ্নের কাঠামো, পাঠ্যবই, শিক্ষাদান পদ্ধতি সব বিষয়েই এমন নিয়ম চালু করেছেন যে শিক্ষকের সৃজনশীলতা বলে কিছু অবশিষ্ট থাকে না। তিনি হয়ে যান করণিক-শিক্ষক।

শিক্ষার ক্ষেত্রে কয়েকটি বিষয় বোঝা অত্যন্ত জরুরি। এক. আগামী দিনে কী ধরনের শিক্ষিতের চাহিদা হবে? বিশ্ববিদ্যালয়কে সে ধরনের শিক্ষার্থী তৈরি করতে হবে, যাদের পক্ষে প্রয়োজনের সঙ্গে তাল রেখে প্রতিযোগিতা করা সম্ভব। আমাদের অনেকেই শিক্ষার সঙ্গে প্রশিক্ষণকেও এক পাল্লায় মাপেন। তারা বোঝেন না, প্রশিক্ষণ যেখানে আমাদেরকে কোনো একটি বিষয়ে পারদর্শী করে থাকে, শিক্ষা সেখানে আমাদের রূপান্তর করে যেন আমরা যেকোনো পরিস্থিতিতে নিজেদের পারদর্শিতা দেখাতে পারি। অর্থাৎ শিক্ষা হবে বিস্তৃত আর প্রশিক্ষণ হবে সংকুচিত। প্রশিক্ষণের ব্যবহার তাত্ক্ষণিক আর শিক্ষার ব্যবহার দীর্ঘমেয়াদি। আমাদের প্রধান সমস্যা হলো, শিক্ষাকে প্রশিক্ষণ থেকে পৃথক রাখা। ফলে শিক্ষিত জনগোষ্ঠী পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে নিজেদের সক্ষমতা প্রদর্শনে সমর্থ হয় না।

দুই. আগামী দিনে শিক্ষিতদের কর্মক্ষেত্র কোথায় হবে? নিজ দেশে নাকি ভিন্ন দেশে? যেহেতু আমরা জানি না, কবে কিংবা কোথায় তাদের কর্মক্ষেত্র হবে, তাই তাদের পাঠ্যক্রম হতে হবে বিশ্বজনীন। পৃথিবীর সর্বত্রই তার দ্বার উন্মুক্ত থাকবে— তাকে এমন পাঠ্যক্রমের আওতায় আনতে হবে। তবে সবাইকে নয়। শিক্ষা ব্যবস্থার অবকাঠামো হবে উন্মুক্ত, যাতে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো নিজেরাই ঠিক করে নেবে কোন ধরনের শিক্ষা পাঠ্যক্রম তারা চালু করবে। শিক্ষা পাঠ্যক্রম যতটা বৈচিত্র্যময় হবে ততই তারা যথাযথভাবে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পাবে। অর্থাৎ কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান তার শিক্ষার্থীকে তৈরি করবে বাংলাদেশের শ্রমবাজার লক্ষ্য করে আর কেউ নজর রাখবে আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারে।

সব শেষে হঠাৎ করেই বিশ্বে চাঁদে যাওয়ার প্রতিযোগিতা বেড়েছে। নিল আর্মস্ট্রংয়ের পর চাঁদে যাওয়ার আকর্ষণ কমে গিয়েছিল। কিন্তু কয়েক বছর আগে চীন ঘোষণা দেয়, ২০২৫ সালের মধ্যে তারা চাঁদে পা ফেলতে চায়। তাদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ভারতও জানিয়েছে, ২০৩০ সালের মধ্যে চাঁদে পৌঁছানো তাদের লক্ষ্য। এ প্রতিযোগিতা কী জন্য? বলতে পারেন, এর ফলে চীন ও ভারত আন্তর্জাতিক লুনার ক্লাবের সদস্যপদ লাভ করবে। আসলে কিন্তু আমার তা মনে

হয় না। আগামী ২০০ থেকে ৫০০ বছরে পৃথিবীতে খনিজ পদার্থের অভাব এতটাই প্রকট হবে যে তখন চাঁদের দখলদাররাই বিভিন্ন খনিজ পদার্থের একচেটিয়া ব্যবসা করবে। তারই প্রস্তুতির মহড়া হচ্ছে এখন। কেউ যাচ্ছেন চাঁদে কেউবা মঙ্গল গ্রহে। শিক্ষা ক্ষেত্রে আগামী দিনের দূরদর্শিতা না থাকলে আমরা ক্রমে শিক্ষিত অপদার্থে পরিণত হব। আশা করি সবাই ভাববেন।

লেখক: অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়

পরিচালক, এশিয়ান সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট

বণিক বার্তা কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত। অনুমতি ছাড়া এই ওয়েবসাইটের কোনো লেখা, ছবি ও বিষয়বস্তু অন্য কোথাও প্রকাশ করা বেআইনি।

সম্পাদক ও প্রকাশক: দেওয়ান হানিফ মাহমুদ

বার্তা ও সম্পাদকীয় বিভাগ : বিডিবিএল ভবন (লেভেল ১৭), ১২ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫

পিএবিএক্স: ৮১৮৯৬২২-২৩, ই-মেইল: news@bonikbarta.com | বিজ্ঞাপন ও সার্কুলেশন বিভাগ ফ্যাক্স: ৮১৮৯৬১৯